বর্ষ ৬ সংখ্যা ৬ জুলাই ২০১৯

প্রান্তজন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন-এর মানবাধিকার ও গণতন্ত্র সনদ (ইআইডিএইচআর)-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের আওতায় সেড প্রকাশিত বার্ষিক নিউজলেটার

সূচি

শ্রীমঙ্গল সম্মেলন
ঢাকায় জাতীয় সম্মেলন
আলোকচিত্র প্রদর্শনী: ব্রাত্যজন
মধুপুর শালবন নিয়ে গোলটেবিল আলোচনা
বিসিএসইউ ও পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে কর্মশালা
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর কর্মশালা
প্রকল্পের সমাপ্তি
পর্যালোচনা
মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন এগোনি
অরণ্যের আর্তনাদ (সিলভান টিয়ারস)
দি স্টেট অফ দ্য এক্সক্লুডেড অ্যান্ড মার্জিনালাইজড কমিউনিটিজ

সম্পাদক
ফিলিপ গাইন

সম্পাদনা সহকারী
জেমস সুজিত মালো ও রবিউল্লাহ

পৃষ্ঠাসজ্জা
প্রসাদ সরকার

উপদেষ্টা
ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন, জয়ন্ত অধিকারী এবং ডেভিড হিলটন

এ নিউজলেটার প্রকাশিত হয়েছে "বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়।

প্রকাশক
সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড)
গ্রীন ভ্যালী, ১৪৭/১ (৩য় তলা), ফ্ল্যাট নং: ২এ, গ্রীন রোড, ঢাকা-১২১৫, ফোন:+৮৮০-২-৫৮১৫৩৮৪৬
ই-মেইল: sehd@sehd.org, www.sehd.org

কাউকে পেছনে ফেলে নয়

শ্রীমঙ্গলে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা বিষয়ক সম্মেলন

শ্রীমঙ্গল সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। ছবি: প্রসাদ সরকার

প্রকল্পের সকল প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ২২-২৩ নভেম্বর ২০১৮ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে 'প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুরক্ষা' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠেয় তিনটি সম্মেলনের দ্বিতীয় সম্মেলন এটি।

সম্মেলনে আয়োজক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর সম্পন্ন গবেষণা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে এবং এ বিষয়ে পথনকশার খসড়া প্রণয়ন করে। পাশাপাশি সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর কর্মকর্তা, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, মানবাধিকার কর্মী এবং সংবাদকর্মীসহ প্রায় ৪০০ জন অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একসাথে কাজ করতে নিজেদের অভিজ্ঞতা, মতামত, চিন্তা–ভাবনা এবং অঙ্গীকার সবার সামনে তুলে ধরেন। ষাটেরও অধিক আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্য সম্মানিত অতিথি ও আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি); অধ্যাপক

এ প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন। এ প্রকাশনায় যেসব দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা আবশ্যিকভাবে দি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর নয়।

ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, উপাচার্য, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি); নুরুল কাদের, ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি; রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ); মো: তোফায়েল ইসলাম, জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার; ড. হরিশংকর জলদাস, বিশিষ্ট লেখক; সুলেখা ম্রং, সভাপতি, আচিক মিচিক সোসাইটি; মো: আব্দুল আউয়াল, ভাইস-চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টি এসোসিয়েশন (বিটিএ); ড. মো: আব্দুল ওয়াজেদ, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান নির্বাহী, গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)।

প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী—আদিবাসী, হরিজন (সুইপার), বেদে, জলদাস (উপকূলের মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী), কায়পুত্র (শূকর চরানো জনগোষ্ঠী), ঋষি (মুচি), যৌনকর্মী, বিহারি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা—বহুমুখী বিচ্ছিন্নতা ও দারিদ্র্যের শিকার। এসব জনগোষ্ঠীর কোনো কোনো সমস্যা আছে যেগুলো একই ধরনের, তবে অধিকাংশ সমস্যাই তাদের নিকট ইউনিক বা ভিন্ন ভিন্ন।

দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর নানা বিষয়ের উপর দুইটি প্লেনারি ও আটটি সমান্তরাল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়গুলো হলো—পরিচয়, ভাষা, সংস্কৃতি ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি; ভূমির অধিকার; শ্রম আইন এবং মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে চুক্তি; এসডিজি অর্জনে চা বাগানের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ঐক্য; আন্তর্জাতিক সনদ ও জাতীয় আইন; বেদে, যৌনকর্মী, ঋষি এবং আরো কিছু জাতিসত্তার বিষয়; চা জনগোষ্ঠী, বেদে ও হরিজনদের প্রজনন ও স্বাস্থ্য অধিকার; এবং প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুরক্ষায় কর্মকৌশল নির্ধারণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। অংশগ্রহণকারীদেরকে গঠনমূলক আলোচনা ও মতবিনিময়ে সম্পৃক্ত করতে সবগুলো অধিবেশনে নির্ধারিত বিষয়ের উপর মূলপ্রবন্ধ এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন লেখা ও অনুসন্ধানী রিপোর্ট উপস্থা করা হয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিচিত্র সব সমস্যাকে বিবেচনায় নিয়ে সেগুলোর সমাধানকল্পে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে যা যা করণীয়: (ক) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আলোচনাকে মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। প্রান্তিকতাকে একটি জাতীয় আলোচ্যসূচিতে পরিণত করতে হবে। পাশাপাশি বৈশ্বিক আলোচনায় প্রান্তিকতাকে সম্পৃক্ত করতে হবে, (খ) সঠিক পরিসংখ্যান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীসমূহের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ বিষয়ে যেসব কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, (গ) ভূমি ও অন্যান্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে, (ঘ) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং (ঙ) স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে এ বিষয়ে সংলাপ ও আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যাবৃক্ষ ও সমাধান তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৭ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে, যা শ্রীমঙ্গল সম্মেলনের মাধ্যমে আরো এগিয়েছে।

সম্মেলনের পাশাপাশি আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক উৎসব: সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মনোমুগ্ধকর ও জাকজমকপূর্ণ সাংস্কৃতিক উৎসব। ২২ ও ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় খাসি, মণিপুরী, মুন্ডা, গারো, ওঁরাও, শব্দকর, সাঁওতাল, তেলেগু, ভূমিজ, বাউরি, চাষা, বিশ্বাস, রাই এবং ঘাটুয়াল জাতিগোষ্ঠীর নয়টি সাংস্কৃতিক দল তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান পরিবেশন করে এবং একটি বিশেষ নাটক মঞ্চস্থ করে। চুনারুঘাট চা বাগানের ১৫ জন তরুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক দল পথিক থিয়েটার নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এ নাটকে চা শ্রমিকদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূমির অধিকার—এসব বিষয়কে উপজীব্য করে তোলা হয়। 'নিজ ভূমে পরবাসী' শীর্ষক এ নাটকে অভিনয় করেন ভূমিজ, গোয়ালা, বাউরি, চাষা, বিশ্বাস, রাই এবং ঘাটুয়াল জাতিগোষ্ঠী থেকে আসা শিল্পীরা। নিজেদের শিকড় বা জন্মস্থানে ফিরে যেতে ১৯২১ সালের ২ মে চা শ্রমিকরা সমবেত হয়ে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন (যা মুলকে চলো নামে পরিচিত) করেছিলো তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই এ নাটকটি তাঁরা নির্মাণ করে। চা শ্রমিকেরা তাদের জীবনে যেসব অত্যাচার, প্রতারণা এবং বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে সেগুলো সামনে তুলে ধরাই এ নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। সকল সাংস্কৃতিক দলের সদস্যরা তাদের চমৎকার

চা বাগানের একটি সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা। ছবি: ফিলিপ গাইন

ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশনার জন্য সাংস্কৃতিক উৎসবে আগত দর্শকদের করতালি ও প্রশংসা পান।

সাংস্কৃতিক দলগুলোর সদস্যদের বিশেষত্ব হচ্ছে তাদের অধিকাংশই চা শ্রমিক ও তাদের সন্তান। মণিপুরী এবং খাসি সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনাও ছিল অত্যন্ত বর্ণাঢ্য এবং মনোমুগ্ধকর।

দুইদিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসবের উভয়দিনই সাংস্কৃতিক পরিবেশনা শুরু হবার আগে ছিল চা জনগোষ্ঠী ও বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক বক্তৃতা যা অনুষ্ঠানে আগত দর্শনার্থীদের চমৎকৃত করে। উভয় দিনই গবেষক, লেখক এবং শিক্ষাবিদেরা চা জনগোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেন। তাদের বক্তব্যে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। চা বাগানে ৮০টি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে যারা ১৪টি ভাষায় কথা বলে। কিন্তু মূলধারার ভাষা ও সংস্কৃতির চাপে চা বাগানের মানুষদের ভাষা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক উৎসবে আলোচকেরা তাদের বক্তব্যে যে বিষয়টি সামনে তুলে ধরে তা হলো, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাদের নানান সমস্যা, বঞ্চনা-বৈষম্য এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাদের শক্তি। তাদের সংস্কৃতি টিকে থাকলেই তাদের পরিচিতি টিকে থাকবে, এমনটিই বলেন অধিকাংশ আলোচক। ❑

কাউকে পেছনে ফেলে নয়

ঢাকায় প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের অধিকার বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন

'মধুপুর: দ্যা ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপর ইন এগোনি' বইয়ের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচনের পর বইটি হাতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ। ছবি: সায়দুর রহমান

২০-২১ জুন ২০১৯ ঢাকার আগারগাঁওয়ের এলজিইডি ভবনে 'প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের অধিকার' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠেয় তিনটি সম্মেলনের সর্বশেষ সম্মেলন এটি। বাংলাদেশে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের বিষয়সমূহ সামনে তুলে ধরা এবং প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদের মানবাধিকারের সুরক্ষা প্রদান ও তাদেরকে দারিদ্র্যের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে একটি সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা তৈরি করা এ সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য।

সম্মেলনে আয়োজক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রকল্পের সময়কালে (সাড়ে তিন বছর) বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উপর করা গবেষণার ফলাফল, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং প্রকাশনা অংশগ্রহণকারীদের সাথে শেয়ার করে। পাশাপাশি সম্মেলনে উপস্থিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর কর্মকর্তা, চা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, আদিবাসীদের প্রতিনিধি, বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি-ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, মানবাধিকার কর্মী, সংবাদকর্মী এবং সাংস্কৃতিক দলসহ প্রায় ৪০০ অংশগ্রহণকারী বিচ্ছিন্নতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং এসব জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় একসাথে কাজ করতে নিজেদের অভিজ্ঞতা, মতামত, চিন্তা–ভাবনা এবং অঙ্গীকার সবার সাথে শেয়ার করেন। ত্রিশেরও অধিক আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশ নেয়। এদের সকলেই বাংলাদেশে বিচ্ছিন্নতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর অধিকারের বিষয়সমূহ সামনে তুলে ধরতে এ সম্মেলনে গৃহীত 'ঢাকা ঘোষণা'র সাথে একাত্মতা পোষণ করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান। উদ্বোধনী অধিবেশনে অন্যান্য সম্মানিত অতিথি ও আলোচক হিসেবে ছিলেন ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি); অধ্যাপক রওনক জাহান, সম্মানীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি); অড্রে মেইলট, টিম লিডার, গভর্নেন্স, ইউরোপীয় ইউনিয়ন; জয়ন্ত অধিকারী, নির্বাহী পরিচালক, খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশে (সিসিডিবি); ড. হরিশংকর জলদাস, বিশিষ্ট লেখক এবং রামভজন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ)।

প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী—আদিবাসী, হরিজন (সুইপার), বেদে, জলদাস (উপকূলের মৎসজীবী জনগোষ্ঠী), কায়পুত্র (শূকর চরানো জনগোষ্ঠী), ঋষি (মুচি), যৌনকর্মী, বিহারি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী—স্বাভাবিক জীবন-যাপন, চাকুরীর নিরাপত্তা, আয়-উপার্জন, সম্পদ, ঋণ সুবিধা, বাসস্থান, শিক্ষা, সংস্কৃতি চর্চা, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, নাগরিকত্ব ও আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার।

দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর নানা বিষয়ের উপর দুইটি প্লেনারি ও সাতটি সমান্তরাল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়গুলো হলো—পরিচয়, সংস্কৃতি ও ভাষা; প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন; আন্তর্জাতিক সনদ ও জাতীয় আইন; প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমস্যাবৃক্ষ অনুধাবন ও বিশ্লেষণে সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা ও উদ্যোগ; মধুপুর শালবন বিনাশ ও শালবন এলাকার গ্রামসমূহের উপর পরিচালিত জরিপ ফলাফলের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন; ভূমির অধিকার এবং প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় কর্মকৌশল নির্ধারণ। অংশগ্রহণকারীদেরকে গঠনমূলক আলোচনা ও মতবিনিময়ে সম্পৃক্ত করতে সবগুলো অধিবেশনে নির্ধারিত বিষয়ের উপর মূলপ্রবন্ধ এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন লেখা ও অনুসন্ধানী রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে "মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন এগোনি" বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয় এবং মধুপুর শালবন নিয়ে অনুষ্ঠিত সমান্তরাল অধিবেশনে "অরণ্যের আর্তনাদ (সিলভান টিয়ারস)" প্রামাণ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়।

সম্মেলনের পাশাপাশি আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক উৎসব: সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক উৎসব। ২০ ও ২১ জুন সন্ধ্যায় গারো, সাঁওতাল, তেলেগু, মান্দ্রাজি, রাজভর, মণিপুরী, বাড়াইক, মাহলে এবং পাহাড়িয়া জনগোষ্ঠীর নয়টি এবং হিজড়াদের একটি সাংস্কৃতিক দল তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান পরিবেশন করে। সাঁওতাল সাংস্কৃতিক দল ২০ জানুয়ারি ২০১৯ সকালে তাদের ঐতিহ্যবাহী দাসাই নৃত্যের (স্বাগত নৃত্য) মাধ্যমে সম্মেলনে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান।

সাংস্কৃতিক দলগুলোর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের বর্ণাঢ্য এবং মনোমুগ্ধকর

ছবি: ফিলিপ গাইন

মাহলে সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা।

পরিবেশনা। অ্যাডভোকেট বাবুল রবিদাসের ম্যাজিক প্রদর্শনী সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক উৎসবে বাড়তি আকর্ষণ যোগ করে। মাহালে ও পাহাড়িয়া সাংস্কৃতিক দলের শিল্পীরা নাচ ও গানের মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্যগত পেশা ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে তুলে ধরে। চা বাগানের শিল্পীদের লাঠি নৃত্য প্রদর্শনী ছিল অসাধারণ।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার উভয়দিন 'সংস্কৃতির মাধ্যমে সাঁওতালদের প্রতিরোধ' এবং 'গবেষণা ও লেখনির মাধ্যমে আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধ' বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা সাংস্কৃতিক উৎসবে আগত দর্শনার্থীদের চমৎকৃত করে। উভয় দিনই গবেষক, লেখক এবং শিক্ষাবিদেরা আদিবাসীদের সংস্কৃতি, শোষণ ও নির্যাতনের ইতিহাস এবং তাদের প্রতিরোধের মাধ্যম নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেন। তাদের বক্তব্যে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো আদিবাসীদের সংস্কৃতির প্রতীক—তীর-ধনুক, মশাল, ঢাক-ঢোল বা মাদল, ঐতিহ্যবাহী নাচ-গান—তাদের প্রতীকী আইকন যেগুলোকে অধিকার আদায়ে প্রতিরোধের মাধ্যম হিসেবে রূপান্তর করা যেতে পারে। পাশাপাশি আলোচকেরা আরো বলেন, প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং তাদের ইতিহাস (যা মুখে মুখে প্রচলিত বা লিখিত) হচ্ছে তাদের শক্তি। ❑

ঢাকা ঘোষণা-২০১৯

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য, বিচ্ছিন্নতা এবং তাদের অধিকার বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত

আমরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ, চা শ্রমিক, হরিজন, ঋষি, জলদাস, কায়পুত্র, বেদে, যৌনকর্মী, হিজরা, রবিদাস, বিহারি, মানবাধিকার কর্মী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং গবেষক যারা দীর্ঘদিন ধরে একসাথে কাজ করছি এবং ঢাকার এলজিইডি মিলনায়তনে সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড), পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি), খ্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) আয়োজিত ২০ ও ২১ জুন ২০১৯ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য এবং অধিকার বিষয়ক জাতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছি তারা এই ঘোষণা করছি, যা ঢাকা ঘোষণা হিসেবে বিবেচিত হবে।

বাংলাদেশের সাড়ে ষোল কোটি মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (প্রায় ৬০ লাখ) জাতিগত পরিচয়, পেশা, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, সংস্কৃতিগত বৈষম্য, ভৌগোলিক অবস্থান, বন্দিদশা ও আরো নানা কারণে বঞ্চনা ও মর্যাদাহানির শিকার। উন্নয়নের মডেল হিসেবে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। কিন্তু এই উন্নয়নের দৌড়ে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষরা সমানভাবে অংশ নিতে পারছে না। ফলে প্রান্তিক এসব জনগোষ্ঠী এখনো চরম দারিদ্র্যে জর্জরিত হয়ে বিপন্ন জীবনযাপন করছে। তাদেরকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ কখনো উন্নয়নের ভালো মডেল হতে পারে না। উল্লেখ্য বাংলাদেশ সরকারেরই এসডিজি সংক্রান্ত অন্যতম অঙ্গীকার হচ্ছে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়'।

আমরা আজ ঢাকা ঘোষণার মাধ্যমে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের ব্যাপারে আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি। একই সঙ্গে আমরা আমাদের প্রধান প্রধান দাবি ও সুপারিশসমূহ তুলে ধরছি।

১। আমরা বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির যেমন দাবি জানাচ্ছি, তেমনি তাদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের দাবিও জানাচ্ছি। সরকার ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখের এক গেজেটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা ২৭ থেকে ৫০-এ উন্নীত করেছে। কিন্তু বাস্তব গবেষণায় দেখা যায় আরো প্রায় ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সরকারি তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। তাদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দাবি জানাচ্ছি। আগামী ২০২১ সালের আদমশুমারিতে এই ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষগুলোর পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)'র কাছে জোর সুপারিশ করছি। যদি প্রয়োজন হয়, এ ব্যাপারে আমরা সকল প্রকার সহযোগিতা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

২। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সাংবিধানিক স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা এবং বিশেষ সুবিধা জোরদার করার জন্য আমরা সরকারের কাছে জোর সুপারিশ করছি।

৩। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ চা-শ্রমিকদের কেবল জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিক ইউনিয়ন করার সুযোগ দিয়েছে। এটি আইনি বৈষম্য। তাছাড়া নৈমিত্তিক ছুটি, অর্জিত ছুটি, গ্র্যাচুইটি, বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ এসব ব্যাপারেও শ্রম আইন বৈষম্যমূলক। চা-শ্রমিক ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য অবসানের জন্য শীঘ্রই শ্রম আইনের যথাযথ সংশোধনের দাবি জানাচ্ছি।

৪। চা-শ্রমিক ও হরিজনসহ অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি সাধারণ সমস্যা হলো মজুরিবঞ্চনা ও আয়বৈষম্য। এদের মজুরি বাড়ানো বিশেষভাবে জরুরি। এ ব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

৫। চা-শ্রমিক, হরিজন, বেদে, যৌনকর্মী, জলদাসসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর

সন্তানেরা যেন কোনোভাবেই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না থাকে, সেজন্য জরুরিভিত্তিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জোর দাবি জানাচ্ছি। উচ্চশিক্ষায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সন্তানদের কোটা নিশ্চিত করারও দাবি জানাচ্ছি।

৬। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষরা অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে শোভন ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ পায় না। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। তাদের সবার জন্য যথাযথ কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ এবং আর্থিক প্রণোদনা দেবার জোর দাবি জানাচ্ছি।

৭। চা-শ্রমিক ও হরিজনরা একেবারেই ভূমিহীন। অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের মাঝেও ভূমিহীনতার হার বেশি। সরকারি খাস জমি পাবার ব্যাপারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি। তবে চা-শ্রমিক ও হরিজনরা যে সরকারি জমিতে শতাধিক বছর ধরে বসবাস করে আসছে, সেখানে তাদের জমির মালিকানা দেবার জোর দাবি জানাচ্ছি। চা-শ্রমিক ও অন্যান্য ভূমিহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা একটি রাষ্ট্রীয় ভূমি কমিশন গঠনের দাবির প্রতিও জোর সমর্থন জানাচ্ছি।

৮। বনভূমিতে যেসব আদিবাসী শত শত বছর ধরে বসবাস করছে তাদের সনাতনী ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে আমরা সরকারের প্রতি আইএলও কনভেনশন-১৬৯-এ অনুস্বাক্ষর করার জোর দাবি জানাচ্ছি। প্রান্তিক মানুষদের অনুকূলে আরো যেসব আন্তর্জাতিক সনদ এবং জাতীয় আইন আছে, সেসবের বাস্তবায়নের জন্যও আমরা সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

৯। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কী অগ্রগতি হচ্ছে, সে ব্যাপারে এসডিজি সংক্রান্ত পরবর্তী সরকারি প্রোগ্রেস রিপোর্টে সুনির্দিষ্ট তথ্য পরিবেশন করার জন্য আমরা সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

১০। আগামীতে যে ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হতে যাচ্ছে, সেখানে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ওপর স্বতন্ত্র ও বিশেষ নজর দেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি।

১১। ভূমি জবরদখল, বনভূমি সংরক্ষণ, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল—এসব ব্যাপারে মানবাধিকার লঙ্ঘনজনিত ঘটনার অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রকাশের ব্যাপারে সরকারি-বেসরকারি তৎপরতা জোরদার করার দাবি জানাচ্ছি।

১২। বাংলাদেশে বাংলা ভাষা ছাড়া আরো যে ৪০-এর অধিক ভাষায় বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষরা কথা বলেন সেসবের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য সরকারি প্রচেষ্টা আরো জোরদার এবং তাদের মাতৃভাষায় তাদেরকে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা দেবার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের দাবি জানাচ্ছি। একই সঙ্গে এসব জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন ও বিকাশের লক্ষ্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার দাবি জানাচ্ছি।

১৩। মধুপুরসহ দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বন মামলা বনভূমিতে বসবাসকারী মানুষের জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ। অভিযোগ আছে এসব বন মামলার সিংহভাগই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা। এসব মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আমরা সরকার, বনবিভাগ এবং বিচারবিভাগের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি।

১৪। অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বংশপরম্পরায় অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্যের শিকার হয়ে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে আছে। তাদেরকে উন্নয়নের যাত্রায় সামিল করতে হলে তাদের জন্য সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধির নানা প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। আমরা সরকারি বাজেটে বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা মোতাবেক দক্ষতা বাড়াবার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তারাও যাতে তাদের প্রতি হৃদয়বান হন তার জন্যও দাবি জানাচ্ছি। এসকল প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জোর দাবি জানাচ্ছি।

১৫। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচিতে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর ন্যায্য চাহিদা ও সুযোগ নিশ্চিত করার দাবি জানাচ্ছি।

১৬। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমির অধিকারসহ অন্যান্য নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের কাছে সবরকম আইনি সহায়তার অঙ্গীকার দাবি করছি এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দেরও দাবি জানাচ্ছি।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, পরিচয় এবং সংখ্যা নিয়ে বিতর্কের অবসান খুব শীঘ্রই হবে এমনটি আশা করা যায় না। তবে চরম দরিদ্র এবং অধিকার বঞ্চিত এসব মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে হলে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবশ্যই সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখা দরকার সব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সমস্যার ধরন এক নয় এবং সেসবের সমাধানও এক নয়। আমরা রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে প্রতিটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার আন্তরিক অঙ্গীকার কামনা করছি। একই সঙ্গে আমরা বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং তাদের সঙ্গে কর্মরত বিভিন্ন সংগঠন 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' এই দর্শন বাংলাদেশে নিশ্চিত করার জন্য আমাদের স্ব স্ব এবং সম্মিলিত অবস্থান থেকে সকল প্রকার উদ্যোগ ও সক্রিয়তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি।

২১ জুন ২০১৯

৩০-এর অধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চার শতাধিক প্রতিনিধির পক্ষে। ❑

আলোকচিত্র প্রদর্শনী
ব্রাত্যজন: বাংলাদেশের প্রান্তিক, বিচ্ছিন্ন এবং সামাজিকভাবে অচ্ছুৎ জনগোষ্ঠী

আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। পাশে আছেন বাঁ থেকে ড. শহীদুল আলম, মোয়াজ্জেম হোসেন, অধ্যাপক আদনান জিল্লুর মোর্শেদ, ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, ড. হরিশংকর জলদাস এবং ফিলিপ গাইন। ছবি: সায়দুর রহমান

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এমন অনেক জাতিসত্তা ও জনগোষ্ঠীর মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যারা বংশপরম্পরায়, শত বছর ধরে এমনকি হাজার বছর ধরে বৈষম্য, শোষণ এবং বিচ্ছিন্নতার শিকার। এর প্রধান কারণসমূহ হলো কল্পিত বাস্তবতায় (ফিকশনাল রিয়ালিটি) বিশ্বাস-অবিশ্বাস, জাতিগত পরিচয়, দাসত্ব, পেশা, জাতিভেদ প্রথা, সংস্কৃতি, স্থানান্তর, ঘৃণা এবং ভৌগোলিক অবস্থান। দরিদ্র, প্রান্তিক এবং বিচ্ছিন্ন এসব মানুষকে ব্রাত্যজন বলা যেতে পারে। ম্যাক্সিম গোর্কির 'দ্য লোয়ার ডেপথস' নাটকে এরা সামাজিকভাবে বাদ পড়া মানুষ এবং হিন্দু বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথা অনুসারে এদের অবস্থান শুদ্রেরও নীচে বা পঞ্চম শ্রেণিভুক্ত। এসব মানুষের সামর্থ্য-বঞ্চনা অনেক গভীরে বিস্তৃত এবং বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের জন্য এ বিষয়টি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

১৯-২৫ জুন ২০১৯ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী চার প্রতিষ্ঠান ঢাকার ধানমন্ডির দৃক গ্যালারিতে ফিলিপ গাইনের ব্রাত্যজন (দ্য লোয়ার ডেপথস) শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

এ প্রদর্শনীতে আদিবাসী ও চা জনগোষ্ঠী, বেদে, কায়পুত্র, যৌনকর্মী, ঋষি, হরিজন, জলদাস এবং বিহারি জনগোষ্ঠীর মানুষদের উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রান্তিক এবং সামাজিকভাবে বাদপড়া মানুষদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এসব জনগোষ্ঠী। এসব জনগোষ্ঠীর পরিচিতি, জীবন-জীবিকা ও তাদের সংগ্রামের উপর প্রায় ২০০টির মতো ছবি এ প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় ১৯ জুন ২০১৯। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রায় ১৫০ জন যাদের মধ্যে ছিলেন আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, নৃবিজ্ঞানী, স্থপতি, চলচ্চিত্র নির্মাতা, গবেষক, লেখক এবং সংবাদকর্মী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ অন্যান্য অতিথিদের সাথে নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল বক্তব্য রাখেন। প্যানেল আলোচকবৃন্দ তাদের আলোচনায় বিচ্ছিন্নতার চ্যালেঞ্জ এবং দেশের নাগরিক হিসেবে উন্নয়নের দৌড়ে সমানভাবে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে এসব জনগোষ্ঠী যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো সামনে তুলে ধরেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করেন। "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে সরকারের পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও লোকসংখ্যা গণনা বা আদমশুমারিতে দেশে বসবাসকারী প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহের সঠিক পরিসংখ্যান নেই এবং তাদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে সেসবে কিছু উল্লেখ নেই," বলেন অধ্যাপক মাহমুদ। "সরকারি পরিকল্পনার মধ্যে এসব জনগোষ্ঠীর অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি যথাযথভাবে আসে না। এখনই সময় সরকারি পরিকল্পনায় তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা ও তাদের সমানাধিকার নিশ্চিত করা।"

"বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে কোনো অতি দরিদ্র মানুষ বা ব্রাত্যজন থাকবে না। দেশের মোট জনসংখ্যার তিন থেকে চার শতাংশ মানুষ ব্রাত্যজন। এসব মানুষকে অদৃশ্য রেখে দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করা কি সম্ভব?" প্রশ্ন অধ্যাপক মাহমুদের।

এ প্রদর্শনীতে চা জনগোষ্ঠী, আদিবাসী, বেদে, হরিজন, জলদাস, ঋষি, যৌনকর্মী, কায়পুত্র এবং বিহারি জনগোষ্ঠীর মানুষের ১১৫টি ছবি স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি ছিল মধুপুর শালবনের উপর আরো ২৫টি ছবি যেখানে তুলে ধরা হয় কীভাবে কৃত্রিম বনায়ন ও অন্যান্য বিষয় হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মধুপুর শালবনের ভূমি ও পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে।

আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেন, "সব সময় দৃষ্টির অন্তরালে থাকা প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হচ্ছে ডকুমেন্টেশন। এ প্রদর্শনীর মুখ্য আলোকচিত্রী ফিলিপ গাইন ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে দেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদেরকে অদৃশ্য থেকে দৃশ্যমান করবার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এসব জনগোষ্ঠীকে দৃশ্যমান করতে হলে আমাদের সকলকে এখন একসাথে কাজ করতে হবে।" ড. রহমান অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এসব জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করার ওপর জোর দেন ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী ড. শহীদুল আলম, স্থপতি ও চলচ্চিত্র নির্মাতা মসিহউদ্দিন শাকের, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইনক্লুসিভ আর্কিটেক্ট অ্যান্ড আরবানিজম-এর নির্বাহী পরিচালক আদনান জিল্লুর মোর্শেদ, লেখক ও ঔপন্যাসিক ড. হরিশংকর জলদাস, সিনিয়র সাংবাদিক চিত্ত ঘোষ, বেদে সর্দার সৌদ খান এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)-এর প্রধান নির্বাহী মোয়াজ্জেম হোসেন। ❑

গোলটেবিল আলোচনা

মধুপুর শালবন: বন বিনাশ, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এবং প্রথাগত ভূমির অধিকার

গোলটেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী। ছবি: প্রসাদ সরকার

"দেশের অবশিষ্ট বনাঞ্চল রক্ষা করতে হলে স্থানীয়দের সাথে এবং বিভিন্ন স্বার্থের সাথে সমন্বয় সাধন করে নীতিমালা তৈরি করতে হবে। তবে সুশাসন ছাড়া এসব নীতিমালা কাজ করবে না যদি না অরণ্য ও অরণ্যচারী মানুষের সুরক্ষার জন্য যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হয়," ২৯ জুলাই ২০১৯ ঢাকার আগারগাঁওয়ের বন ভবনে 'মধুপুর শালবন: বন বিনাশ, জনসংখ্যাগত পরিবর্তন এবং প্রথাগত ভূমির অধিকার' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় এসব কথা বলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। গোলটেবিল আলোচনায় ১২০ জনের মতো অংশগ্রহণকারী যোগ দেন।

গোলটেবিল আলোচনার প্রধান অতিথি অধ্যাপক মাহমুদ আরো বলেন, "যদিও আমাদের দেশে ভূমি ও বনসম্পদের পরিমাণ খুবই কম, তবু যেটুকু আছে তা সংরক্ষণ করার পেছনে জাতীয় স্বার্থ রয়েছে। বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ বিশেষ করে মধুপুরে বন কমে আসছে। এখন আমরা এমন জায়গায় পৌঁছেছি যে একে অপরকে দোষারোপ করে কোনো কাজ হবে না। সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারই পারে অবশিষ্ট বনাঞ্চল রক্ষা করতে এবং মধুপুর বন এলাকায় ভূমি নিয়ে জটিলতার বিষয়সমূহ সমাধান করতে।"

গোলটেবিল আলোচনায় মধুপুর শালবন এলাকার ৪৪টি গ্রামের ওপর পরিচালিত জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক জরিপ থেকে প্রাপ্ত প্রধান তথ্য-উপাত্তসমূহ উপস্থাপন করেন সেড-এর পরিচালক ফিলিপ গাইন। "একসময়কার গারো ও কোচ অধ্যুষিত মধুপুর শালবন এলাকায় আজ বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহে জরিপ চালানো পাঁচটি ইউনিয়নের (কুড়াগাছা, ফুলবাগচালা, বেরিবাইদ, শোলাকুড়ি এবং অরণখোলা) ১১,০৪৮ পরিবারের মধ্যে ৬৪.৬১ শতাংশ বাঙালি ও ৩৫.৩৯ শতাংশ গারো," জানান গাইন। "ভূমির দখল ও মালিকানা মধুপুর বন এলাকার গ্রামসমূহের একটি জটিল বিষয়। সেখানে মাত্র ১৩ শতাংশ বাঙালি এবং ৪.১৯ শতাশ গারো পরিবারের বসতভিটার সিএস অথবা আরওআর (স্বত্ব দলিল) আছে। যার অর্থ হলো অধিকাংশ পরিবারের বসতভিটার মালিকানা প্রথাগত বা স্বত্বদখলীয়। সেখানে অন্যান্য ধরনের জমির (উঁচু জমি ও নীচু জমি) স্বত্ব দলিল আছে খুবই কম সংখ্যক পরিবারের।"

"সামাজিক বনায়ন মধুপুরে বন মামলা ও স্থানীয় মানুষদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার একটি বড় উৎস। জরিপ চালানো ৪৪টি গ্রামে বন মামলা পাওয়া গেছে ৩,০২৯টি। বাঙালিদের বিরুদ্ধে বন মামলা ২,১৫৭টি এবং গারোদের বিরুদ্ধে ৮৭২টি। অবশিষ্ট বন রক্ষা করতে ও মিথ্যা বন মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করতে প্রয়োজন যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ।"

গোলটেবিল আলোচনার সমাপনী বক্তব্যে অনুষ্ঠানের সভাপতি পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বন বিভাগ ও মধুপুর বন এলাকার বাসিন্দাদের বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা ও দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সংলাপ আয়োজনের আহবান জানান। "মধুপুর বন এলাকায় আমরা তিন ধরনের স্বার্থ—বন সংরক্ষণ, কৃষি এবং সেখানে বসবাসকারীদের (গারো ও বাঙালি) চাহিদা দেখতে পাই। এসব স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে না পারলে মধুপুর বন রক্ষা পাবে না। আমাদেরকে আগে এসব স্বার্থ বুঝতে হবে এবং সেসবের আলোকে আলোচনার মাধ্যমে একটি টেকসই সমাধান খুঁজে বের করতে হবে," মধুপুরে ভূমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা প্রসঙ্গে বলেন ড. রহমান।

মধুপুরে বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষদের প্রথাগত ভূমির অধিকারের বিষয়ে তিনি বলেন, "মধুপুর শালবন এলাকায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিকাংশেরই ভূমির স্বত্ব দলিল নেই। তাদের ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা যদি দালিলিকভাবে সমাধান করা না যায় তাহলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজির দৃষ্টিকোণ থেকে তা সমাধান করা যেতে পারে।" তিনি বন বিভাগকে আলোচনার মাধ্যমে আপসযোগ্য বন মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করার এবং সেখানকার বন সম্পূর্ণভাবে বিনাশ হওয়া ঠেকাতে কমিউনিটি ফরেস্ট ওয়ার্কারদের (সিএফডব্লিউ) মধ্যে গারো প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করার বিষয়ে পরামর্শ দেন। একই সাথে তিনি মধুপুরে বন বিভাগ, গারো এবং বাঙালিদের দখলে থাকা জমির উপর একটি সুনির্দিষ্ট জরিপ পরিচালনারও পরামর্শ দেন।

গোলটেবিল বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মো: ইউনুস আলী, সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক (সিসিএফ); থিওফিল নকরেক, গারো লেখক; ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী সমাজ কল্যাণ সংস্থা; সুলেখা ম্রং, নির্বাহী পরিচালক, আচিক মিচিক সোসাইটি; ড. তানজিমুদ্দিন খান, অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মোহাম্মদ জহিরুল হক, সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক; হারুন অর রশীদ, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, টাঙ্গাইল বন বিভাগ; অজয় এ মৃ, সভাপতি, আদিবাসী কালচারাল ডেভেলপমেন্ট ফোরাম; বিকসন নকরেক, মেম্বার, শোলাকুড়ি ইউনিয়ন; আব্দুল মজিদ মল্লিক, উন্নয়নকর্মী; ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, আরণ্যক ফাউন্ডেশন; আক্তার হোসেন, চেয়ারম্যান, শোলাকুড়ি ইউনিয়ন এবং মো: আব্দুর রহিম, চেয়ারম্যান অরণখোলা ইউনিয়ন। ❑

বিসিএসইউ ও পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে কর্মশালা

শ্রীমঙ্গলে ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০১৮ এ আবাসিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। চা শ্রমিকদের একমাত্র ইউনিয়ন বিসিএসইউ যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে থাকে সেগুলো সামনে তুলে ধরা এবং চা বাগানে শ্রম আইন ও শ্রমমান লঙ্ঘনের (বিশেষ করে গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে) ক্ষেত্রে নানা অনিয়ম মনিটরিং করবার জন্য যেসব আইন রয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ করা এ কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল উপজেলা এবং সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলা থেকে বিসিএসইউ-এর পঞ্চায়েত, ভ্যালি এবং বাগান পর্যায়ের ২৮ জন নেতৃবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় চা শ্রমিকদের একমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিসিএসইউ-এর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং দর কষাকষির দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারীরা চা শ্রমিক সম্পর্কিত শ্রম আইনের যেসব সেকশন বা ধারা (মজুরি, গ্র্যাচুইটি, চাকুরী নিশ্চিতকরণ ও নিয়োগপত্র, রেশন, আবাসন, ইউটিলিটি এবং শিক্ষা সম্পর্কিত) প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হয় সেসবের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং তারা উল্লেখ করেন চা বাগানের প্রকৃত অবস্থা সামনে তুলে ধরতে এসব অনিয়মের উপর একটি জরিপ চালানো অত্যন্ত প্রয়োজন। এসবের পাশাপাশি অংশগ্রহণকারীগণ শ্রম আইন ও শ্রমমান লঙ্ঘন এবং অন্যান্য অনিয়মের বিশ্লেষণ ও মনিটরিং করবার জন্য বিসিএসইউ-এর একটি নিজস্ব গবেষণা ও প্রকাশনা শাখার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন। সবশেষে চা শ্রমিকদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার (এসআরএইচআর) সম্পর্কিত নানা বিষয় যেমন, মাসিক চলাকালে পরিচর্যা, টিকা, বাল্য বিবাহ, গর্ভকালীন পরিচর্যা, পুষ্টি, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি কর্মশালায় বিশেষ গুরুত্বসহকারে আলোচনা হয়। ❑

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের আদিবাসী নেতৃবৃন্দের সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর কর্মশালা

১২-১৪ জানুয়ারি ২০১৯ আদিবাসীদের নিজস্ব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, সিসিডিবি এবং জিবিকে-এর ভিলেজ ফোরাম (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাঁচটি জেলা থেকে আগত) থেকে ২৩ জন নেতৃবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) এবং ক্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) দিনাজপুরের পার্বতীপুরের গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রে (জিবিকে) এ কর্মশালার আয়োজন করে। সংগঠন পরিচালনা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সামনে তুলে ধরতে নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কীভাবে আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির বিকাশ করা যায় সে বিষয়ে কর্মকৌশল প্রণয়ন করা ছিল এ কর্মশালার উদ্দেশ্য।

কর্মশালায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার, ভাষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একটি প্যানেল তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং তারা নানা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন পরামর্শ দেন। দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির যেসব ক্ষেত্র নিয়ে এ কর্মশালায় আলোচনা হয় সেগুলো হলো সংগঠনের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আদিবাসীদের সুরক্ষায় সংগঠনের ভূমিকা ও সাংগঠনিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কৌশলসমূহ, আদিবাসীদের নিয়ে কর্মরত সংগঠনসমূহের যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করার উপায় ও পদ্ধতি, আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী সংগঠনসমূহের বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন আইন বিশেষত আদিবাসীদের ভূমির সুরক্ষা সংক্রান্ত পূর্ববঙ্গীয় ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এবং সিসিডিবি'র পিপলস ফোরাম ও তাদের কার্যাবলী। কর্মশালায় আদিবাসীদের ভূমির অধিকার নিয়ে নির্মিত সেড-এর তথ্যচিত্র মাটির মায়া (এলিজি অন ল্যান্ড) প্রদর্শন করা হয় যেখানে তুলে ধরা হয়েছে ভূমি নিয়ে আদিবাসীদের সীমাহীন দুর্ভোগ ও বাধা-বিপত্তির ঘটনা বিশেষ করে পৈত্রিক ভূমি রক্ষা করতে গিয়ে তাদের শারীরিকভাবে নির্যাতিত হওয়ার বিভিন্ন খন্ডচিত্র।

দলীয় কাজে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের শক্তি, তহবিল গঠন ও তা যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্বলতা এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিত করেন। ❑

প্রকল্পের সমাপ্তি

"বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন, তাদের বর্তমান অবস্থার চিত্রায়ণ এবং তাদের সক্ষমতা ও যোগাযোগ বৃদ্ধি" শীর্ষক সাড়ে তিন বছর মেয়াদি প্রকল্পটি শুরু হয় ২০১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হয় ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই। প্রকল্পের আওতায় অনুষ্ঠেয় সকল কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য—সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অঙ্গনে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা—বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) এবং অন্যান্য পার্টনার সংগঠন—পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি), ক্রিস্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এবং গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)—যৌথভাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইকো কোঅপারেশন-এর সহায়তায় পরিচালিত এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। প্রকল্পের পাঁচ সহযোগী সংগঠন—উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসীদের নিয়ে কর্মরত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভিত্তিক সংগঠন জাতীয় আদিবাসী পরিষদ (জেএপি), টাঙ্গাইলের মধুপুর ভিত্তিক দুটি সংগঠন জয়েনশাহী আদিবাসী সমাজ কল্যাণ সংস্থা (জেএএসকেএস) ও আচিক মিচিক সোসাইটি (এএমএস) এবং চা শ্রমিক ও চা জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত চা বাগান ভিত্তিক দুটি সংগঠন মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট (এমসিজেএফ) ও বাগানিয়া—প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন ও তাদের নিয়ে গবেষণা এবং তাদের প্রয়োজন ও সীমাবদ্ধতাসমূহ চিত্রায়ণ করতে গিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংগঠনসমূহ, প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী একসাথে কাজ করেছে। চূড়ান্ত উপকারভোগী ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর দশটি গুচ্ছ থেকে প্রায় ১৭,০০০ প্রতিনিধি প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন সম্মেলন, কর্মশালা, পরামর্শ সভা, গবেষণা ও প্রকৃত জরিপ, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান, আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং প্রয়োজন ও সমস্যা চিত্রায়ণে

অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে ৫৪৪ জন মানবাধিকার কর্মী যারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী, কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন এবং সংবাদ মাধ্যম থেকে আসা ব্যক্তিবর্গ। সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় তাঁরা সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে অংশ নেয়া ব্যক্তিবর্গ প্রতিনিধিত্ব করেছেন ২২৮টি সংগঠন, ৭৩টি চা বাগান ও ভ্যালি (প্রতিটি চা বাগানে রয়েছে কমপক্ষে একটি পঞ্চায়েত যা একটি সংগঠন) এবং ১০০টি সংবাদ মাধ্যমের।

প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চূড়ান্ত উপকারভোগী—সমতলের আদিবাসী, চা জনগোষ্ঠী, হরিজন (সুইপার), কায়পুত্র (শূকর চরানো জনগোষ্ঠী), বেদে, জলদাস (জলের দাস), যৌনকর্মী, ঋষি, বিহারি এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞায়ন ও তাদের উপর গবেষণা চালানো। টাঙ্গাইলের মধুপুর শালবন এলাকার ৪৪টি গ্রামের ১১,০৪৮ পরিবারের উপর একটি ব্যতিক্রমধর্মী জরিপ চালানো হয়। গবেষণা, জরিপ এবং অনুসন্ধানে চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর মানুষদের থেকে আসা কমিউনিটি সদস্য ও নেতৃবৃন্দ, লেখক এবং গবেষকের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। সাতটি মনোগ্রাফ, বই, জরিপ রিপোর্ট এবং প্রকাশিত অন্যান্য উপকরণ বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর গুরুত্বপূর্ণ রিসোর্স। এসব প্রকাশনা প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর উপর বিদ্যমান যে তথ্যভাণ্ডার রয়েছে তাকে আরো সমৃদ্ধ করবে।

সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর আয়োজিত সকল প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা—জাতীয় পর্যায়ে একটি, গবেষণা ও অনুসন্ধান পদ্ধতি নির্ণয় নিয়ে একটি, সাংবাদিকদের নিয়ে একটি, মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহে বসবাসকারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর মাঠ গবেষণা ও বিশ্লেষণ নিয়ে একটি, যৌনকর্মীদের নিয়ে একটি, চা শ্রমিকদের সংগঠন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বিসিএসইউ) এবং চা বাগানের পঞ্চায়েত নেতাদের নিয়ে দুটি, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী নেতাদের নিয়ে একটি, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তাদের সংগঠন নিয়ে একটি, বিহারি ও হরিজনদের নিয়ে কর্মরত মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে একটি, বেদে জনগোষ্ঠী নিয়ে একটি—এবং মধুপুর শালবন নিয়ে একটি গোলটেবিল আলোচনা প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর দক্ষতা, সক্ষমতা, নেটওয়ার্ক এবং যোগাযোগ বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এসব জনগোষ্ঠীর বিষয়ে নানান তথ্য-উপাত্ত, অন্তর্দৃষ্টি এবং গবেষণা ফলাফল বিনিময় করতে তিনটি সম্মেলন—রংপুরে একটি, শ্রীমঙ্গলে একটি এবং ঢাকায় একটি—প্রান্তিক ও অন্যান্য উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের একত্রিত করেছে। সম্মেলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে ছিল আদিবাসী ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা। সারা দেশ থেকে ২০টির মতো সাংস্কৃতিক দল এসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছে। ঢাকায় আয়োজিত ব্রাত্যজন (দ্য লোয়ার ডেপথস) শীর্ষক একটি বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর মানুষদেরকে সবার সামনে তুলে ধরেছে। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরামর্শ সভা প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীদের মধ্যে যোগাযোগ ও নেটওয়ার্ক আরো বৃদ্ধি করেছে। চল্লিশ হাজারেরও বেশি কপি বই, নিউজলেটার, পোস্টার, ফ্লাইয়ার, ব্রশিওর, ক্যালেন্ডার, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহের উপর জরিপ রিপোর্ট এবং মনোগ্রাফ ছাপা হয়েছে এবং এসব প্রকাশনা প্রকল্পের চূড়ান্ত উপকারভোগী ও উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে।

ঢাকায় জাতীয় সম্মেলনে অংশগহণকারীদের একাংশ। ছবি: প্রসাদ সরকার

প্রকল্পের শেষে প্রান্তিক ও বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের নিয়ে কাজ করে এমন নেটওয়ার্ক ও প্রতিষ্ঠান এবং এ বিষয়ে যারা আগ্রহী তাদেরকে সহায়তা দেবার জন্য একটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন সকল প্রকাশনা: (ক) দি স্টেট অফ দ্য এক্সক্লুডেড অ্যান্ড মার্জিনালাইজড কমিউনিটিজ (ইংরেজি, ২৪৪ পৃষ্ঠা, ২০১৯) (খ) মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন এগোনি (ইংরেজি, ১৬৪ পৃষ্ঠা), (গ) সাতটি মনোগ্রাফ—কায়পুত্র: অ্যা কমিউনিটি ইন সোশ্যাল ডিগনিটি (ইংরেজি), দি হরিজন অফ বাংলাদেশ (ইংরেজি), জলদাস: অ্যা সিফারিং ফিশিং কমিউনিটি (ইংরেজি), দি বিহারিজ: অ্যা কমিউনিটি কট ইন ক্যাম্প লাইফ (ইংরেজি), বেদে: অ্যা ফ্লাটিং পিপল অফ বাংলাদেশ (ইংরেজি), দি ঋষিজ অফ দ্যা সাউথওয়েস্ট (ইংরেজি) এবং হালনাগাদ চিত্র ২০১৯: বাংলাদেশের যৌনপল্লী ও যৌনকর্মী (বাংলা), (ঘ) এ ভলিউম অন ইন্টারন্যাশনাল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যান্ড ন্যাশনাল ল'স (ইংরেজি), (ঙ) প্রশিক্ষণ উপকরণ ও সহায়িকা: প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিয়ে কর্মরত কর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (বাংলা, ২৫৬ পৃষ্ঠা); আদিবাসীদের সমস্যা ও প্রয়োজন এবং মানবাধিকার কর্মীদের আচরণবিধি ও সুরক্ষা নির্দেশিকা (বাংলা) (চ) প্রজেক্ট ফ্লাইয়ার (ইংরেজি, থ্রি-ফোল্ড) (ছ) প্রজেক্ট ব্রশিওর (দুইটি, বাংলা, ২৪ পৃষ্ঠা ও ৪৮ পৃষ্ঠা), (জ) তিনটি নিউজলেটার সংখ্যা (বাংলায় প্রান্তজন এবং ইংরেজিতে পিপল অন দ্য ফ্রিঞ্জ, ২০ পৃষ্ঠা), (ঝ) তিনটি ক্যালেন্ডার (২০১৭, ২০১৮ এবং ২০১৯), (ঞ) সাতটি পোস্টার (ট) দুইটি আলোকচিত্র প্রদর্শনী ক্যাটালগ (বাংলা, ১১২ পৃষ্ঠা; ইংরেজি, ৩৬ পৃষ্ঠা), এবং (ঠ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপর তিনটি ফ্লাইয়ার (ইংরেজি ও বাংলা)।

প্রামাণ্যচিত্র: (ক) ইংরেজিতে 'সিলভান টিয়ারস' এবং বাংলায় 'অরণ্যের আর্তনাদ' (মধুপুর শালবন বিনাশের উপর নির্মিত, ৪০ মিনিট) এবং (খ) বাংলায় 'পথে পথে' এবং ইংরেজিতে 'লাইফ অন দ্য মোভ' (বেদে জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে নির্মিত, ৩০ মিনিট)। ❑

পর্যালোচনা

মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন এগোনি

ইংরেজি, ১৬৪ পৃষ্ঠা। ২০১৯।

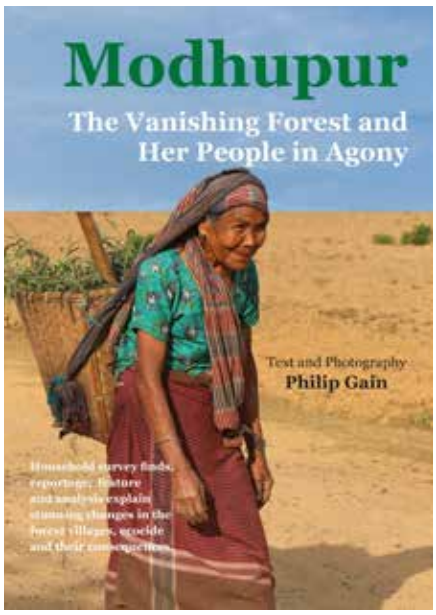

টাঙ্গাইল জেলার ১২টি উপজেলার একটি মধুপুর শালবন এবং গারো ও কোচদের জন্য সুপরিচিত। সরকারি হিসাবে এ বনের আয়তন ৪৫,৫৬৫.১৮ একর (টাঙ্গাইল অংশ)। ব্রিটিশ শাসনামলে এ বন ছিল নাটোরের মহারাজার জমিদারি সীমানার অন্তর্ভুক্ত ঘন জঙ্গল। একসময় শুধুমাত্র গারোরা ছিল মধুপুরের গভীর জঙ্গলের আদি বাসিন্দা। কিন্তু আজ মধুপুর শালবন শুধু নামেই। প্রাণবৈচিত্র্যসহ এ বনের বেশিরভাগই আজ বিলীন হয়েছে। মধুপুরের বনভূমিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কলা, আনারস ও মসলার আবাদ দিনদিন বেড়েই চলেছে। মধুপুর শালবনে আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হওয়া রাবার চাষ ও সামাজিক বনায়নের (প্রকৃত অর্থে যা মনোকালচার প্লানটেশন বা কৃত্রিম বনায়ন) উদ্দেশ্য ছিল জনগণের কল্যাণ। কিন্তু বাস্তবে এগুলো মধুপুর বনাঞ্চল ও সেখানকার পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতিসাধনই করেছে।

মধুপুর শালবনের সঠিক ইতিহাস ও বাস্তব চিত্র সামনে তুলে ধরার জন্যই এই বই। ২০১৭-২০১৮ সালে পরিচালিত বেসলাইন জরিপ থেকে প্রাপ্ত নানান তথ্য-উপাত্ত, নব্বই দশকের শুরুর দিক থেকে এ বনের উপর লেখা বিভিন্ন রিপোর্ট, ফিচার এবং বেশ কিছু আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে এ বই-এ। মধুপুর শালবন এলাকার ৪৪টি গ্রামের উপর এই জরিপে দেখা যায়, মুঘল আমল থেকে মধুপুর শালবনে বসবাসকারী গারোরা বর্তমানে এসব গ্রামের মোট জনসংখ্যার ৩৩.৪৭%। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং জমিদারি প্রথার বিলুপ্তির সাথে যে বিষয়টি মধুপুর শালবন এলাকার সবচাইতে উদ্বেগের তা হলো রাষ্ট্র সেখানকার গ্রামসমূহে বসবাসকারী মানুষের ভূমির অধিকারের স্বীকৃতি দেয়নি। ভূমির অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া মধুপুর শালবন এলাকার গ্রামসমূহে বসবাসকারী মানুষের আর কোনো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে না। ❑

অরণ্যের আর্তনাদ (সিলভান টিয়ারস)

মধুপুর শালবন, এর বিনাশ এবং অরণ্যচারী মানুষের বিপন্নতা নিয়ে নির্মিত ৪০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (সেড) প্রযোজিত 'অরণ্যের আর্তনাদ' (সিলভান টিয়ারস) শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্রে মধুপুর শালবনের বর্তমান অবস্থা, এর বিনাশ এবং অরণ্যচারী মানুষ ও বন বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এতে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে প্রাকৃতিক বন ধ্বংস করে সামাজিক বনায়নের আদ্যোপান্ত, বনমামলা এবং বনবাসী মানুষের হয়রানি চিত্রায়িত হয়েছে।

এ প্রামাণ্যচিত্রে হত্যা ও বন মামলাসহ অরণ্যচারী মানুষের উপর চালানো শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা এবং মধুপুর শালবনের নজিরবিহীন বিনাশের পেছনে যেসব গুরুতর কারণ রয়েছে সেগুলো তুলে ধরা হয়েছে। পুরো টাঙ্গাইল জেলায় বন মামলার সংখ্যা পাঁচ হাজারের মতো, যার সাড়ে চার হাজারই মধুপুর শালবন এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের বিরুদ্ধে। প্রামাণ্যচিত্রে বন মামলার আসামিরা তাদের সীমাহীন দুর্ভোগের কথা তুলে ধরেছেন।

মধুপুর বন বিনাশের পেছনে প্রধান যেসব কারণ সেগুলো হলো: ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু হওয়া রাবার চাষ, ১৯৮৯ সাল থেকে চালু হওয়া সামাজিক বনায়ন এবং শাল-গজারি বিশিষ্ট প্রাকৃতিক বনের জায়গায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কলা, আনারস ও মসলার চাষ।

প্রামাণ্যচিত্রে মধুপুরের নিপীড়িত মানুষের হাহাকার দেখা যায়। রাষ্ট্রের কাছে সেখানকার মানুষের প্রধান আবেদন বনভূমি ও অরণ্যচারী মানুষের সুরক্ষা। ❑

দি স্টেট অফ দ্য এক্সক্লুডেড অ্যান্ড মার্জিনালাইজড কমিউনিটিজ

ইংরেজি, ২৪৪ পৃষ্ঠা। ২০১৯।

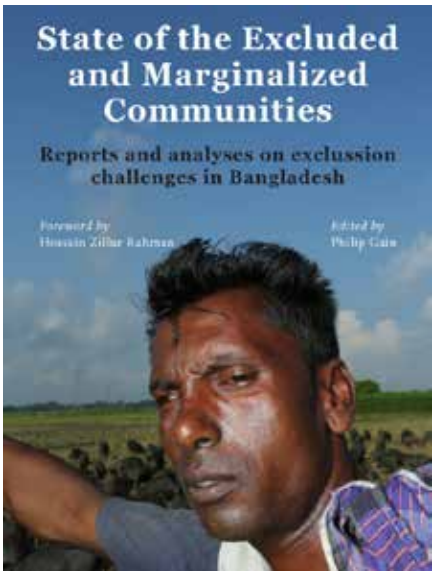

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদপড়া জনগোষ্ঠী—আদিবাসী, চা শ্রমিক, বেদে, হরিজন, জলদাস, যৌনকর্মী, কায়পুত্র (শূকর চরায় যে জনগোষ্ঠী) এবং বিহারিদের নিয়ে এ রিপোর্ট। এসব মানুষের অবস্থা, সমস্যা ও ঝুঁকি নিয়ে বিশ্লেষণ, অনুসন্ধানী রিপোর্ট এবং তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা কীভাবে দেয়া সম্ভব তা নিয়ে কর্মকৌশল সন্নিবেশিত হয়েছে এ রিপোর্টে।